**Pratidhwani the Echo**
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
**ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)**
**Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 131-137
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
**DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.056**

# আধুনিক নাট্যদৃষ্টিভঙ্গির সন্ধানে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের নাটক: একটি বিশ্লেষণ

**রাণু রায়,** *গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়, বোলপুর, বীরভূম*
**হেমন্ত ভট্টাচার্য,** *অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়, বোলপুর, বীরভূম*

Received: 16.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

Siddheshwar Chattopadhyay constitutes a significant chapter in his dramatic works to develop of Modern Sanskrit. He has used modern structure, technics and language. His subject matter is profoundly reflected. This research expresses the concept of morality, consciousness. The conflict between society and individual. His dramas protrays the crisis of contemporary reality. His plays are unique as it is different from conventional plot and allegorical structure and dialogue. He describes internal psychological conflict over external event. Without it his plays express social, political and moral questions. His also influenced by western modern dramatic thought. The aim of this research is to identify the characteristics of the modern theatrical perspective in his plays and to evaluate his contribution to the tradition of Sanskrit drama

**Keywords**: Modern Sanskrit, Social, Political, Conventional, Morality.

ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরবময় ইতিহাসে সংস্কৃত নাটক এক অমূল্য ও প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শাখা। মহর্ষি ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্র অনুসারে নাট্যের উপাদান, গঠন, চরিত্রচিত্রণ, রস, অলংকার ইত্যাদির সুন্দর ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংস্কৃত নাটক এক পূর্ণাঙ্গ শিল্পসৃষ্টি হয়ে ওঠে। প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, শূদ্রক ভবভূতি প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রমুখ নাট্যকারগণ তাঁদের অভূতপূর্ব সৃষ্টি দিয়ে এক অনন্য সাহিত্যসম্ভার সৃষ্টি করেন। এই সমস্ত সাহিত্যিকদের নাট্যধারায় দেখা যায় মূলতঃ পৌরাণিক কাহিনী, রাজনীতি, ধর্মীয় উপাদান, গৌরবগাথা এবং রসের চমৎকার বিন্যাস। এই নাটকগুলি ছিল রাজসভায় নৈতিক শিক্ষাদান, মনোরঞ্জন ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বাহক। এই ঐতিহ্যবাহী ধারার বিপরীতে যখন আমরা আধুনিক সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করি সেখানে প্রথাগত রীতিকে উপেক্ষা করে এক অভিনব উপস্থাপনা করা হয়েছে। এই রূপান্তরের অন্যতম প্রধান প্রবর্তক হিসেবে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অগ্রগণ্য। তিনি প্রচলিত রীতির বদলে গ্রহণ করেছেন এক প্রতীকধর্মী, ব্যঙ্গাত্মক এবং সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক সংকট বোধসম্পন্ন নাট্যভাষা। তিনি 'ধরিত্রীপতিনির্বাচনম্', 'অথ কিম্', 'স্বর্গীয়হসনম্' ও 'ননাবিতাড়নম্' নামে এই চারটি নাটক রচনা করেছেন। এই নাটকগুলি পৌরাণিক কাহিনী, গৌরবগাথা প্রভৃতি প্রাচীন কাহিনীর বদলে সমকালীন সমাজ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ভাষার অস্তিত্ব সংকটের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রথাগত নাট্যরীতিকে অতিক্রম করে এক অভিনব শৈলীর আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি পরিহাস, দ্ব্যর্থক বাক্য ও প্রতীক নাট্যে অন্তর্নিহিত অর্থকে রূপকে ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন নাট্যকারদের

পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় তাঁরা মূলতঃ ধার্মিক, নৈতিকতা, রাজপ্রশংসা প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সামাজিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, ভাষার অবক্ষয়কে নাটকের কেন্দ্রে এনেছেন, যা সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ও অভিনব। এই নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কিভাবে প্রাচীন নাট্যরীতির গণ্ডি অতিক্রম করে এক সম্পূর্ণ নতুন নাট্যকর্ম, দৃষ্টি, আঙ্গিক ও নাট্যভাষার সূচনা করেন।

**প্রাচীন নাট্যধারার বৈশিষ্ট্য: ভাস কালিদাস ও অন্যান্য**- প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ধারা সাধারণত ভরতমুনি রচিত 'নাট্যশাস্ত্র'কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই ধারায় নাটক কেবল মনোরঞ্জনের মাধ্যম নয়, বরং নীতিশিক্ষা, ধর্মানুশাসন, রসাস্বাদন এবং সমাজ চেতনার এক গুরুত্বপূর্ণ বাহক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এই 'নাট্যশাস্ত্র' সম্মত নাট্যধারার প্রাচীন ও প্রধান নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ।

**ভাস**- প্রাচীন ভারতের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম নাট্যকার হলেন ভাস। মহাকবি কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের প্রস্তাবনাংশে বলেছেন-

"প্রথিতযশসাং ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধান্ অতিক্রম্য।
কথং বর্তমানস্য কবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ বহুমানঃ।।"[১]

এই শ্লোকের দ্বারা অনুমান করা হয় যে, কালিদাসের পূর্বে নাট্যকার ভাসের আবির্ভাব হয়। ভাসের আবির্ভাব সংক্রান্ত তথ্য না পাওয়া গেলেও খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে অনেকে মনে করেন।

রাজশেখর বলেছেন- "ভাসের নাটক (সমালোচনার) আগুনে দগ্ধ হলেও 'স্বপ্নবাসবদত্ত' নাটকটি সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল।"[২]

নাট্যকার জয়দেব 'প্রসন্নরাঘব' নাটকে বলেছেন- ' ভাস হলেন সরস্বতীর নির্মল হাস্য।'[৩]

প্রাচীন ও অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর নাট্যকৃতির প্রশংসা ছাড়া অন্য কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রিবান্দমে পদ্মনাপুরম অঞ্চলে মনলিক্কর মঠে মোট ১৩ টি সংস্কৃত নাটক আবিষ্কার করেন। কিন্তু নাট্যকার ভাস সেখানে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করেন নি। শাস্ত্রী মহাশয় নাটকগুলির ভাষা, রচনা পদ্ধতি ও নাট্যকৌশল তুলনামূলকভাবে বিচার করে কালিদাস, বাণভট্ট প্রভৃতি প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণের ভাস সম্পর্কে করা প্রশংসাসূচক উক্তির সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, এইসব নাটকগুলি একই ব্যক্তির রচনা এবং প্রথিতযশা নাট্যকার ভাস হলেন রচয়িতা।

নাটকে 'প্রস্তাবনা'র পরিবর্তে 'স্থাপনা' শব্দের ব্যবহার, নাট্যকারের নাম অনুল্লেখ, নান্দীশ্লোকে মুদ্রালঙ্কারের প্রয়োগ, অপাণিনীয় পদের ব্যবহার, নাট্যকৌশল, কবিকল্পনা প্রভৃতি ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ভাস রচিত ১৩টি নাটক

রামায়ণাশ্রিত- প্রতিমা,অভিষেক।
মহাভারতাশ্রিত- কর্ণভার, ঊরুভঙ্গ, দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ, পঞ্চরাত্র, বালচরিত, মধ্যমব্যায়োগ।
বৃহৎকথাশ্রিত- স্বপ্নবাসবদত্ত, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ। লোককথাশ্রিত- চারুদত্ত ও অবিমারক।

প্রাচীন ভারতের নাট্যচর্চার পথপ্রদর্শক হলেন মহাকবি ভাস। ভাসের নাট্যরচনায় সরলতা, সাবলীলতা ও নাট্যকৌশলের চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। নাটকের ভাষা প্রাঞ্জল ও প্রাণবন্ত হওয়ার কারণে দর্শকদের মনে সরাসরি প্রভাবিত করে। নাটকের সংলাপ ছিল সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল। চরিত্রচিত্রণেও তিনি পাণ্ডিত্যের

পরিচয় দিয়েছেন। নাটকে শ্লেষ, মুদ্রালঙ্কার ও কাব্যরীতির প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। পৌরাণিক কাহিনী, রোমান্টিকতা ও বীরত্ব গাথার মাধ্যমে ভাসের নাটকগুলিতে উপস্থাপিত হয়েছে সংস্কৃত নাট্যের প্রাচীন ভিত্তি।

**মহাকবি কালিদাস ও নাট্যকৃতি**

সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর ও নাট্যকার হলেন কালিদাস। তাঁর নাট্যকৃতির মধ্যে 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্', 'বিক্রমোবর্শীয়ম্', ও 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' তাঁর শ্রেষ্ঠ নাট্যকৃতি। নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করে তিনি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে রস, ভাব ও শিল্পরীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য, প্রেমের অনুরাগ, নারী সত্তা, স্নিগ্ধতা ও ধর্মীয় আদর্শকে অপূর্ব অলংকারমণ্ডিত ভাষায় নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন। রাজা - রাণীর প্রেম, বিরহ ও পুনর্মিলনকে কেন্দ্র করে নাটকগুলি রচিত। তাঁর নাটকের বাচনভঙ্গি মাধুর্যপূর্ণ ছন্দোবদ্ধ ও আধ্যাত্মিক আবেশময়। শিল্পসৌন্দর্য ও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের সমন্বয়ে কালিদাসের নাট্যকৃতিকে কালজয়ী করে তুলেছে।

**ভট্টনারায়ণ ও বেণীসংহার-** প্রাচীন ভারতের এক বিশিষ্ট সংস্কৃত নাট্যকার হলেন ভট্টনারায়ণ। পণ্ডিতদের মতানুসারে অনুমান করা যায় যে, আদিশূর সপ্তম থেকে নবম শতকের মধ্যবর্তী কোনও কালে গৌড়বঙ্গের রাজা ছিলেন এবং ভট্টনারায়ণ তারই সভাসদ ছিলেন। ভট্টনারায়ণ 'বেণীসংহার' নামক একটি নাটক রচনা করেন। মহাভারতের উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য পর্বের প্রধান প্রধান কাহিনী অবলম্বনে রচিত ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক। কাহিনীর কেন্দ্র ভাগে রয়েছে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে কেশ আকর্ষণপূর্বক অপমান করলে ভীম প্রতিজ্ঞা করেন যে কুটিলাচারি দুঃশাসনকে হত্যা করে তারই রক্তে রঞ্জিত হাত দিয়ে দ্রৌপদীর বেণী সংহার (বেণী বন্ধন) করবেন। নিপুণভাবে চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের দক্ষতাও অসামান্য। নাটকের ভীমের শৌর্যবীর্য ও আত্মবিক্ষোভ, দুর্যোধনের আত্মম্ভরিতা, দ্রৌপদীর ওজস্বিতা, যুধিষ্ঠিরের বীরত্ব ও ন্যায়বোধ এবং যুদ্ধক্ষেত্রের বিভিন্ন মুহূর্ত প্রভৃতি নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন। তবে বর্ণনা অনাবশ্যক বিস্তার ও সংলাপে দীর্ঘতা নাট্যগতিকে আংশিকভাবে ক্ষুণ্ণ করলেও তথাপি নাট্যবিশারদগণ 'বেণীসংহার' নাটকটিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্যবহার করেছেন, যা নাটকটি কাব্যিক ও নাট্য তাত্ত্বিক গুরুত্বকে প্রমান করে।

নাটকের কাহিনী উৎস মহাভারত হলেও নাট্যকার এই নাটকে উৎসভূত বৃত্তান্ত পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং প্রয়োজনে কাল্পনিক পর্ব সংযোজন করেছেন। যেমন অশ্বত্থামা ও কর্ণের বিতর্ক, চার্বাক ও ধর্মের সংলাপ, গদাযুদ্ধে ভীমার্জুনের মৃত্যু সংবাদ প্রভৃতি কাহিনী।

ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকটি প্রাচীন নাট্যধারায় রচিত। এই নাটকের কাহিনীর উৎস মহাভারতের যুদ্ধ ও বীরত্বমূলক ঘটনা। নাটকের চরিত্রসমূহ রাজা-রাণী, বীরপুরুষ ও গৌরবময় নায়ক, যারা মূল্যবোধ ও চারিত্রিক গুণের রূপকার। নাটকের উদ্দেশ্য দর্শকদের মধ্যে নীতিবোধ, জ্ঞান, ধর্ম, চিন্তা ও মনোরঞ্জন করা।

প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য রীতিতে সামগ্রিকভাবে কিছু মৌলিক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। বেশিরভাগ নাটকের বিষয় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকে কেন্দ্র করে রচিত। ফলস্বরূপ পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক পটভূমি এই নাট্যধারায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। নাটকের চরিত্র চিত্রণে দেখা যায় রাজা, রাণী, পুরোহিত, সেনাপতি, ঋষি চরিত্রের আধিক্য। শৃঙ্গার, বীর, করুণ প্রভৃতি রস ও অলংকার সমৃদ্ধ ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে দর্শককে আনন্দ দান করা। তবুও এসব নাটকে নৈতিক উপদেশ কর্তব্যবোধ এবং ধর্মচিন্তার প্রতিফলন স্পষ্ট এবং দর্শককে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান করত।

সংস্কৃত সাহিত্যের পরিধি বিশাল ও ব্যাপক। অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্য বলতে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, শূদ্রক প্রভৃতি গ্রন্থ ও কবিকেই বোঝেন। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য যেন এক অলীক কল্পনা। অনেকের ধারণা যে ঊনিশ, কুড়ি বা একুশ শতক সংস্কৃত সাহিত্যের চরম অন্ধকারের যুগ। এই সময়ে সেভাবে কোন সাহিত্য রচিত হয়নি। কিন্তু বাস্তবতা হলো বহু মনীষীর লেখনীদীপ্তিতে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যরূপ রত্ন ভাণ্ডার আরও উজ্জ্বল। এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের ন্যায় বাংলার ভূখণ্ডেও মনীষী তাঁদের নিষ্ঠা ও প্রতিভা দিয়ে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যকে এক নতুন প্রাণ, গতি ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছেন। পঞ্চানন তর্করত্ন, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, রমা চৌধুরী নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ প্রমুখ ও বঙ্গীয় পণ্ডিতদের সাহিত্য সাধনা আধুনিক সংস্কৃত কাব্যকে নির্মল জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত করেছেন। এইসব আধুনিক প্রতিভাবান স্রষ্টাদের মধ্যে অভিনব চিন্তাভাবনা ও প্রতিবাদী স্বর নিয়ে এক যুগের সূচনা করেন, তিনি হলেন সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

বর্তমান বাংলাদেশের যশোর জেলার নহাটা গ্রামে ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পিতার নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পেশায় ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। মাতা প্রমোদা সুন্দরী দেবী। বাল্যকাল থেকেই তাঁর সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা। স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য এবং দেশপ্রেমী হওয়ার কারণে অবস্থায় তাঁকে একাধিকবার কারাবরণ করতে হয়। সেজন্য তার সারস্বত জীবনের শুভারম্ভ হয় অনেক দেরিতে। তিনি ছিলেন ছাত্রদের মধ্যে বড়। তাই তিনি ছিলেন সকলের প্রিয় 'বুড়োদা'। তিনি জীবনযুদ্ধে হার না মেনে রাজশাহী, বর্ধমান ও কলকাতায় শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি সাগরনন্দীর 'নাটক লক্ষণ রত্ন কোষ' নিয়ে গবেষণা করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি পি.এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যচিন্তার মূল উদ্দেশ্য ছিল- সমাজের কপটতা ও বৈপরীত্যের বিরুদ্ধে এক নির্ভীক প্রতিবাদ। তাঁর নাটকে কোন পৌরাণিক কাহিনী, বীরত্বগাথা, রোমান্টিকতা নেই। আছে বিদ্রোহ, প্রশ্ন, প্রতিবাদ, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ। তিনি 'ধরিত্রীপতিনির্বাচনম্', 'অথ কিম্', 'স্বর্গীয়হসনম্' ও 'ননাবিতাড়নম্' এই চারটি নাট্যগ্রন্থেই বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির সংকট, শোষণ ও দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। তাঁর সংলাপ ছিল তীব্র, ব্যঙ্গাত্মক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। নাটকের নান্দী ও ভরতবাক্যের মধ্যেও তিনি সৃষ্টি করেন প্রতিবাদ ও নতুন ভাবনার বীজ।

তাঁর নাটকগুলিতে জার্মান নাট্যকার ব্রেখট- এর প্রভাব অনস্বীকার্য। অ্যালিয়েশন এফেক্ট নাটকে দর্শকদের ভাবনা জাগ্রত করার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার ধারণা ও রাজনীতির নাট্যচর্চার ধারা তাঁর নাটকে নতুন প্রাণসঞ্চার করে, তিনি দেখিয়েছেন নাটক কেবল মনোরঞ্জনের জন্য নয়, তাতে শিক্ষামূলক মূল্য থাকা উচিত। তাই তাঁর নাটকে রাজনীতি, ভোটসন্ত্রাস, সংস্কৃত ভাষার অমর্যাদা, গভীর ব্যঙ্গ ও প্রতীক রূপে উঠে এসেছে।

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় শুধু একজন নাট্যকার নন, তাঁর জীবন, কর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গি আজও অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির গভীর সূক্ষ্ম ও পর্যবেক্ষণ তাঁকে করে তুলেছে এক ব্যতিক্রমী ও চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

প্রাচীন নাটকের বিষয়বস্তু সাধারণত পৌরাণিক ও বীরত্ব গাথা হলেও সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় রচিত চারটি নাটকে স্থান পেয়েছে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা, ক্ষমতার লালসা, ভাষার অস্তিত্ব সংকট। যেমন 'ধরিত্রীপতিনির্বাচনম্' নাটকে আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে লেখা একটি অনবদ্য ব্যঙ্গ নাটিকা। নাটকে ধরিত্রীর বা পৃথিবীর পতি কে হবেন এই নিয়ে লেখা প্রহসনমূলক নাটক। নাট্যকার নাটকে জাতিসংঘের অধ্যক্ষ নির্বাচনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শক্তিশালি দেশগুলি দুর্বল দেশগুলির উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা এবং অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা ভীতি প্রদর্শনের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। এই সংস্থা

১৯৪৫ সালে গঠিত হয়। কিন্তু সংস্থা সমস্যা সমাধানে কতটা অক্ষম তা কৌতুক ও রূপকধর্মী শৈলীতে উপস্থাপন করা হয়েছে। নাট্যকার আধুনিক ও কূটনৈতিক সমস্যাকে নাট্যরূপে উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে এক অভিনব সৃষ্টিশৈলী প্রদর্শন করেছেন। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যর্থতা, ক্ষমতার লালসা, কূটনৈতিক সমস্যা, বিশ্বরাজনীতির কপটতা তীক্ষ্ণ শ্লেষের মাধ্যমে প্রকাশ করে নাটকটি সময়োপযোগী ও অনন্য হয়ে উঠেছে।

নাট্যকার এই নাটকে ধ্রুপদী নাট্যরীতি থেকে বেরিয়ে এসে পরীক্ষামূলক রূপ দিয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ, দুর্নীতি, ধর্মঘট, ভোটসন্ত্রাস, রিগিং, মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মতো কঠিন বাস্তবতাকে নাট্যকার শ্লেষ রসাত্মকভবে উপস্থাপন করেছেন, যা দর্শকদের মনোরঞ্জন করে আবার একই সাথে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে। সমকালীন রাজনৈতিক ব্যঙ্গ, প্রতীকী উপস্থাপনার সমন্বয়ে আধুনিক সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এক অভিনব ও চিত্তাকর্ষক সৃষ্টিতে এই নাটকটি রূপান্তরিত হয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 'ধরিত্রীপতিনির্বাচনম্' নাটকের চরিত্রগুলিকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক শক্তিশালী ও দুর্বল দেশগুলির প্রতীক রূপে চিত্রিত করেছেন, যা নাটকটিকে এক অনন্য রূপকধর্মী মাত্রা দিয়েছে। নাটকে প্রতিটি চরিত্র কেবল ব্যক্তিগত সত্তা নয়, বরং রাজনৈতিক শক্তি এবং আধিপত্যের প্রতীক। শক্তিমান দেশগুলির চরিত্রে ক্ষমতার লোভ, আধিপত্য ও অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে দুর্বল দেশগুলিকে নিয়ন্ত্রণ প্রবণতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে নাটকে। অপরদিকে দুর্বল দেশগুলির চরিত্রে নির্ভরশীলতা ও রাজনৈতিক চাপে নতি স্বীকারের চিত্র দেখা যায়। চরিত্রগুলির সংলাপ ও রাজনৈতিক অসঙ্গতি শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে এবং দর্শকের কাছে একাধারে হাস্যরসাত্মক ও চিন্তাপ্রসূত হয়ে ওঠে। আধুনিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে রূপকের মাধ্যমে মানবায়িত চরিত্রে রূপায়ণ- এখানেই নাটকের চরিত্র বিন্যাসের স্বকীয়তা বিদ্যমান।

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'অথ কিম্' নাটকটি এক অভিনব ভাবনার ফসল। তিনি সমাজের নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি তীব্র কষাঘাত হেনেছেন। সমাজের উচ্চ থেকে নিম্ন শ্রেণীর সকল স্তরের মানুষের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছেন। ভোট আসে, ভোট যায়। নেতা মন্ত্রীরা ভোট আদায়ের জন্য প্রতিশ্রুতি দেয়। মানুষ নিরন্তর অপেক্ষা করে। কিন্তু অপেক্ষা থামে না। অসমাধেয় জীবনের মতো অতৃপ্তি নিয়ে নাটকের শেষ হয়।

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'অথ কিম্' নাটকের চরিত্রবিন্যাস সম্পূর্ণ প্রচলিত নাট্যরীতি বহির্ভূত ও প্রতীকধর্মী। নাটকের চরিত্রগুলির কোন নাম নেই। পুরুষ চরিত্রগুলি ক, খ, গ, ঘ, ঙ এবং স্ত্রী চরিত্রগুলি আ, ঊ ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, মনোভাব ও রাজনৈতিক প্রবণতার প্রতীক। প্রতীকী চরিত্রগুলি সমগ্র সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রতিটি চরিত্রের সংলাপ ও আচরণে নৈরাজ্য ক্ষমতার লালসা, নির্বাচনী দুর্নীতির বাস্তব চিত্র পরিস্ফুট হয়ে হয়ে উঠেছে।

চরিত্রের অভিনবত্বের ক্ষেত্রে প্রত্যেক চরিত্রই সংসদীয় রাজনীতির মানসিক ও দুর্বলতার প্রতীক। নেতা, মন্ত্রী সাংসদদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি, ষড়যন্ত্র ও জনকল্যাণের প্রতি উদাসীনতার চরিত্র স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকার প্রতিটি চরিত্রের সংলাপ ও তাদের কার্যকলাপ সবই রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন, প্রতীকী অথচ বাস্তবধর্মী এই চরিত্র বিন্যাস ও বাস্তব রাজনৈতিক ব্যঙ্গের সমন্বয় এই নাটকের বিষয়বস্তু ও চরিত্রের দিক থেকে অভিনব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় রচিত 'স্বর্গীয়হসনম্' নামক একটি ব্যঙ্গাত্মক রূপক। নাট্যকার নাটকে সংসদীয় রাজনীতির আড়ালের দুর্নীতি, দ্বিচারিতা ও অনৈতিক কার্যকলাপকে তীব্র শ্লেষে উপস্থাপন করেছেন। মন্ত্রী,

সাংসদ, রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি, লোভ, চক্রান্ত নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। নাটকে সংসদের কার্যপদ্ধতি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হলেও তার অন্তর্গত শূন্যতা ও অর্থহীনতাকে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়েছে। নাটকের বিষয়বস্তু সমকালীন ও যুগোপযোগী রাজনৈতিক প্রহসনের রূপ দিয়েছে। বাস্তব রাজনৈতিক সংকট ও ক্ষমতার অপব্যবহারকে সরাসরি আঘাত করে এই নাটকটি আধুনিক সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে একটি অভিনব ও প্রাসঙ্গিক সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

এই নাটকে চরিত্রের নামকরণেও নাট্যকার মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যকার প্রচলিত পৌরাণিক চরিত্র দেবতা বৃহস্পতি ও ইন্দ্র ঐতিহাসিক চরিত্র অশোক ও মুঘল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বসিয়ে স্বার্থসিদ্ধি, দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের প্রতীক করেছেন। আবার নাটকের শেষে কৃষক ও শ্রমিক প্রতিনিধি ধুন্ধ ও পুঙ্গের উপস্থিতি সাধারণ মানুষের অধিকার তুলে ধরে। প্রতিটি চরিত্রের নামকরণ প্রতীকী ও ব্যঙ্গাত্মক রূপে তুলে ধরা হয়েছে নাটকে। এই নাটকের চরিত্রগুলি কেবল নাটকীয় রূপক নয়, বরং সমাজ ও রাজনীতির বাস্তব রূপের প্রতিফলন।

আধুনিক সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে 'ননাবিতাড়নম্' নাটকটি এক অভিনব ব্যঙ্গাত্মক সৃষ্টি। নাটকটি আঙ্গিক ও উপস্থাপনা উভয়ই প্রথাবিরোধী। নান্দীহীন এই নাটকের শুরু থেকেই কুশীলব ও দর্শকদের মধ্যে একটি যোগাযোগ স্থাপনের উদ্যোগ দেখা দিয়েছে, যা সংস্কৃত নাট্যরীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নাটকে 'ননা' অর্থাৎ এখানে সংস্কৃত ভাষার কথা বলা হয়েছে। জননীস্বরূপা সংস্কৃত ভাষার উপর ইংরেজী, হিন্দী ও বাংলা ভাষার দাপট লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে শীর্ষব্যক্তিদের চক্রান্ত, মূর্খতাকে নগ্নভাবে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। নাট্যকারের ভাষার প্রতি আবেগ, ব্যঙ্গের তীব্রতা এবং নাট্যসংগীতের হৃদয়গ্রাহ্যতা মিলিয়ে এই নাটকটির বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অনন্য।

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 'ননাবিতাড়নম্' নাটকের চরিত্রসমূহ প্রতীক ও ব্যঙ্গাত্মক। নাটকের 'ননা' সংস্কৃত ভাষার প্রতীক। পূরবী, উত্তরা, বিদেশিনী, স্বকুম্ভ' বসুকুম্ভ, ভকুম্ভ ডাক্তাররা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের প্রতিরূপ। প্রত্যেকে সংস্কৃত ভাষাকে মৃত বলে ঘোষণা করে মরণোত্তর সম্মান প্রদর্শন করতে চেয়েছেন। নাট্যকার এই প্রতীকী উপস্থাপন নাটকের চরিত্র সমূহকে অভিনব উজ্জ্বল করেছে।

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় নাটকের ভাষা ভাব প্রকাশের পাশাপাশি তীব্র প্রতিবাদ এর এক বলিষ্ঠ অস্ত্র। প্রচলিত অলঙ্কারযুক্ত সাবলীল ভাষার পরিবর্তে তিনি ভাষাকে ভেঙে নীরবতার মাধ্যমে অভিনব নাট্যভাষা সৃষ্টি করেছেন। অসমাপ্ত ও খণ্ডিত প্রতীকী সংলাপের মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট অর্থ না বলেও গভীর অর্থের ইঙ্গিত দেন। এই ভাষা দর্শককে অস্বস্তির মাধ্যমে ভাবতে বাধ্য করে। ভাস বা কালিদাসের নাট্য যেখানে অলঙ্কার, ছন্দ ও রস মুখ্য সেখানে সিদ্ধেশ্বরের ভাষার ভগ্নতা ও অস্পষ্টতাকেই শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। নাট্যকারের না বলা কথাই সবচেয়ে জোরালো প্রতিবাদ প্রকাশ করে। ভাষার এই ব্যর্থতা ও দ্বন্দ্ব আধুনিক সমাজের অবক্ষয়, ক্ষমতার ঔদ্ধ্যতকে প্রতিফলিত করে। এই কারণে নাট্যকারের ভাষা প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরের পাশাপাশি দর্শকদের বিবেক ও সচেতনতাকে তীব্রভাবে আন্দোলিত করে।

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় নাটকে 'ননা', 'পূরবী', 'উত্তরা', 'ক', 'খ', 'চিকিৎসক' প্রমুখ চরিত্র বাস্তবে কোন ব্যক্তির প্রতিরূপ নয়, বরং প্রতীক। যেমন 'কলম' শুধু লেখার জন্য নয়, জ্ঞান, মতপ্রকাশ, বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির প্রতীক।

প্রাচীন নাট্যকারেরা নাট্যশাস্ত্রোক্ত রীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন। নাটকে নান্দী, সূত্রধার, অঙ্কবিন্যাস, কাহিনীর ধারাবাহিকতা ও অলঙ্কারময় ভাষা অপরিহার্য উপাদান ছিল। রস সঞ্চারের পাশাপাশি

নৈতিক শিক্ষা প্রদানই ছিল নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। পৌরাণিক ও রাজা- রাণীকে কেন্দ্র করে গঠিত চরিত্রের মাধ্যমে দর্শককে পরিচিত ও সুসংহত নাট্য জগতে নিয়ে যেত। অন্যদিকে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রথাগত নাট্যরীতিকে ভেঙে এক নতুন ধারার সূচনা করেন। তাঁর নাটকে নান্দী নেই এবং অঙ্ক ভিত্তিক সুগঠিত কাঠামোর অভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর নাটকে পৌরাণিক চরিত্র নয়, আছে নাগরিক জীবনের প্রতিনিধি এবং তারা প্রায় সকলেই প্রতীকধর্মী। তাঁর নাটকের মূল উদ্দেশ্য হলো মনোরঞ্জনের পাশাপাশি দর্শকের মনে প্রশ্ন তোলা এবং সচেতনতা জাগ্রত করা। এভাবেই সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের আধুনিক সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় নাটকের বিষয়, ভাষা, চরিত্র ও গঠন এই সবকিছুতে মৌলিকতা এনেছেন। তাঁর নাটকে সৌন্দর্যের পরিবর্তে অস্থিরতা এবং প্রশ্নের মধ্যেই নাট্যবোধ গঠিত হয়। প্রাচীন নাটক যেখানে দৃষ্টিনন্দন, সেখানে সিদ্ধেশ্বরের নাটক মননশীল ও গভীরভাবে রাজনৈতিক।

নাট্যকার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সার্থকভাবে উপলব্ধি করেন যে, সংস্কৃত ভাষা ও নাট্যধারা কেবলমাত্র প্রাচীন ঐতিহ্য নয়, তা আজও বাস্তব, প্রাসঙ্গিক ও চিন্তনীয়। যেখানে প্রাচীন নাট্যকাররা রাজা, রাণী, দেবতা, প্রেম, পরিণয়, নৈতিকতার কাহিনী তুলে ধরেছেন সেখানে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক সমস্যা, সাধারণ মানুষের দুর্দশা, সামাজিক এবং ভাষার অস্তিত্ব সংকট প্রভৃতি তুলে ধরেছেন। তিনি দেখান যে, আধুনিক সমস্যাকে সংস্কৃত ভাষাতেও তুলে ধরা যায় এবং সেই ভাষা পুঁথিগত নয়, বরং প্রতিক্রিয়াশীল ও সচেতন হতে পারে। নাট্যকার এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রাচীন নাট্যরীতির মূল সুর বজায় রেখে সেটিকে সমকালীন চিন্তাধারা ও বাস্তব চিত্রের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তাঁর রচিত নাটকগুলি কেবল মনোরঞ্জন করে না, মননে আলোড়নও তোলে। প্রাচীন নাট্যকারদের সঙ্গে তুলনা করলেই প্রতীত হয় যে, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কতটা স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী। তিনি ঐতিহ্যের সংস্কৃত নাট্যধারাকে বর্তমান সমাজের প্রতিচ্ছবি, প্রতিবাদ ও প্রতীকের সঙ্গে একত্রিত করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন।

**তথ্যসূত্র:**

১। "প্রথিতযশসাং ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধান্ অতিক্রম্য। কথং বর্তমানস্য কবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ বহুমানঃ।।" মালবিকাগ্নিমিত্র প্রস্তাবনা।

২। ভাসনাটকচক্রেঽপি/ ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্। স্বপ্নবাসবদত্তস্য/ দাহকোঽভুন্ন পাবকঃ।। সূ. মু. ৪।৪৮

৩। ভাসো হাসঃ, কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।

**গ্রন্থপঞ্জি:**

১। ধরিত্রী-পতি-নির্বাচনম্, বুড়োদা রচিত, কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ, ১৩৭১,

২। চট্টোপাধ্যায়, ঋতা। সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বুড়োদা) ও তাঁর রচিত অথ কিম্। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা: ২০০৬।

৩। চট্টোপাধ্যায়, ঋতা। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য। কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৯।

৪। ঘোষাল, বনবিহারী। অর্বাচীন (আধুনিক) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। আগরতলা: পারুলপ্রকাশনী, ২০২২।

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দরনাথ। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১২।